

Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীচরিত্র।। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র ।। মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Soumitra Sekhar
Published online	February 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v40i3.12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.12
Pages	247-254
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ পরিচয়

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীচরিত্র। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র ও মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য। সম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আধুনিক কালের বর্ণিল বহুমাত্রিক জীবন প্যাটার্নের হাতছানিতে মানুষ অগ্রসরমান সামনের দিকে— কখনো ভেবে, কখনো ভাবার অবকাশ নেই বলে। অথচ, শেকড়ের সন্ধান যদি করতে হয়, তাহলে তো দৃষ্টি ফেরাতেই হবে পশ্চাতে; অনুসন্ধান করতে হবে তারই মধ্যে সম্মুখে অগ্রবর্তী হবার নিয়ামক শক্তির উৎস। কিন্তু বর্তমানকালে বাঙালির পুরোনো সাহিত্য আর ঐতিহ্যকে অনুসন্ধান বিশ্লেষণ করার মানসিক ইচ্ছে আর কর্ম-তৎপরতা যেন কমে আসছে। অথচ, পুরোনো কাল, ওই সময়ের সাহিত্য-শিল্পকে আধুনিক দৃষ্টির পরাকাষ্ঠায় বিচার-বিবেচনা করলে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে অনেক প্রত্ন-রহস্য। তবে এর জন্যে চাই প্রচণ্ড ইচ্ছে-শক্তি, অধ্যবসায় এবং অবশ্যই ধী-বিদ্যার সর্বোচ্চ চর্চা, লালন ও প্রয়োগ। শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পিএইচ.ডি., ডি.লিট্) বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্যানুসন্ধানে বিশ্বাসী হয়ে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বিষয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। বিদেশি ব্যাঙ্কের উচ্চপদের চাকুরি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে তিনি বর্তমানে সার্বক্ষণিক সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর রচিত মধ্যযুগ বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীচরিত্র' (১৯৯১), 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষচরিত্র' (১৯৯২), 'মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৯৪), 'বাংলা সাহিত্য : একাল ও সেকাল' (১৯৯৪), 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি' (১৯৯৬), 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজ' (১৯৯৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর প্রথম তিনটি গ্রন্থ নিয়ে বর্তমান আলোচনা। ইতোমধ্যেই গ্রন্থগুলোর একাধিক সংস্করণ জানান দেয়, সুধীমহলে এর প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পঞ্চভূতে'র 'নরনারী' প্রবন্ধে বলেছেন যে, বাংলা সাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের মতো নিশ্চলভাবে ধূলি-শয়ানে অধিষ্ঠিত, আর নারীরা তার বক্ষের উপর জাগ্রতভাবে বিরাজমান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে কবির বক্তব্যের যাথার্থ্য বুঝা যায়। যে-ভাবেই নর-নারীর অবস্থান হোক না কেন, ধূলিশায়িত মহাদেব ও জাগ্রত দণ্ডায়মান শ্যামার যৌথ স্থাপনই একটি পরিপূর্ণতা যেমন উদ্ভাসিত করে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষ

চরিত্রের সমন্বয়েই ফুটে ওঠে সমগ্রতা। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্য অনেকেই চরিত্র ব্যাখ্যার বিরোধী হতে পারেন। যাঁরা রসবাদী— কাব্যে রস সন্ধান যাঁদের একমাত্র কর্ম, তাঁদের বক্তব্য, প্রাচীন কবিরা রসকেই প্রধান করেছেন, ঘটনা বা চরিত্র এসেছে অবলম্বন হিসেবে। ফলে চরিত্রের বিশ্লেষণে মুখ্য সৃষ্টি রস বিপন্ন হতে পারে। তাঁরা 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' থেকে অতুলচন্দ্র গুপ্তর মত তুলে বলতে পারেন যে, নারীদেহের লাবণ্যের মতোই কাব্যের সৌন্দর্য, যা রক্ত-মাংসের অতিরিক্ত আরও কিছু। চরিত্র-ব্যাখ্যায় এতে বিঘ্ন অনিবার্য। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, অতুলচন্দ্র একটি সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করে ওই কথা বলেছেন মাত্র। রসাত্মক বাক্য মানেই কাব্য— এই সংস্কৃত সাহিত্য-বিচার পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে হুবহু প্রয়োগ না করাই বিধেয়। কেননা, 'চর্যাপদ', যাকে আমরা সাহিত্য বলে আজ বিবেচনায় আনছি, তা সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে রচিত হয় নি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও সংস্কৃত কাব্যরীতির যথাযথ অনুসরণ হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। তবে কতিপয় বৈষ্ণব কবি যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও শাস্ত্রাক্রান্ত ছিলেন একথাও তো স্বীকার করতে হয়। এসব মনে রেখেই রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুসারে বলা চলে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রসের পাশাপাশি চরিত্র অনেকটা প্রাধান্য অর্জন করে। চরিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ না করলে সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করা যায় না, আদর্শগত মূল্যকে তো ছোঁয়াও চলে না— এ সত্য স্বীকৃতি পেয়েছে। সে মার্গ ধরেই পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'History of Bengali Literature' গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের চরিত্রভাবনা ফুটে উঠেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে— 'বিদ্যাপতির রাধিকা', 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'সাহিত্য সৃষ্টি' ইত্যাদি প্রবন্ধে চরিত্র বিষয়ক আলোচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি কর্ম, 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র মার্জিনে মন্তব্য। কলিকাতা থেকে অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এটি বের হয়েছে। এতে চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্রগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভেদী বিশেষ টীকা-মন্তব্য আছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, ভূদেব চৌধুরী, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্র গুপ্ত প্রমুখ প্রথিতযশা পণ্ডিত ও গবেষক মধ্যযুগ বিষয়ক আলোচনায় চরিত্র-ব্যাখ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষ করা গেছে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমালোচকগণই পূর্বসুরিদের অপেক্ষায় বেশি আগ্রহী হয়েছেন চরিত্রালোচনায়। এটাই সম্ভবত যুগ লক্ষণ। নবযুগের মানদণ্ডে পুরোনো সাহিত্যের মধ্যেও নতুনত্ব আবিষ্কারের মানসিকতা বোধ করি এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত আলোচ্য একটি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন : 'মধ্যযুগের সংস্কৃতি এবং সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী হলেও শম্ভুনাথ আধুনিক মনের মানুষ, কোন অংশেই রক্ষণশীল নয়। জাতীয় ধর্ম এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল

হলেও কোন বিষয়েই নির্বিচার নয়, যুক্তিবোধে তার মন জাগ্রত, নতুনকে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখচিত্র।' নির্বাচিত তিনটি গ্রন্থেই লেখকের এই আধুনিক মনের যৌক্তিক-যুক্তির-পরম্পরা ও রসবোধ লক্ষ করা যায়।

ডক্টর শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত তিনটি গ্রন্থেই একটি অন্যটির পরিপূরক। তথাপি আলোচনার সুবিধার্থে চরিত্রালোচনা বিষয়ক বই দুটো একত্রে এবং ধর্মভাবনা সম্পর্কিত গ্রন্থটি আলাদা করে নেয়া আবশ্যক। 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীচরিত্র' এবং 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষচরিত্র' গ্রন্থ দুটো মূলত একই পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত। দুটোতেই চারটি করে প্রধান অধ্যায় বা পর্ব রয়েছে; যার প্রথমটিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে গৃহীত বিচার-পদ্ধতি। এখানে গবেষক ছয়টি মানদণ্ড হাজির করেছেন। তবে 'পুরুষচরিত্র' গ্রন্থে এই পর্বটি আরও একটু বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে চরিত্র সৃষ্টির চারটি পদ্ধতির উল্লেখ আছে :

১. বিবরণধর্মী : অধিকাংশ গৌণ চরিত্র

২. নাট্যধর্মী : চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডের শিব চরিত্র

৩. বিশ্লেষণধর্মী : মুকুন্দরামের ধনপতি

৪. কাব্যধর্মী : বৈষ্ণব-শাক্ত পদসমূহের চরিত্র

চরিত্রগুলোর শ্রেণীবিভাগ হয়েছে এভাবে : নীতিধর্ম বা আদর্শ প্রচারক, সরল, জটিল, অগভীর, গভীর, স্থির, বিবর্তমান ও রসাশ্রয়ী। আবার এসবের আন্তমিশ্রণও ছকের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য তিনটি অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও বিবিধ কাব্য, যেমন শাক্ত পদাবলী, নাথসাহিত্য, গীতিকা সাহিত্য ইত্যাদি থেকে নারী ও পুরুষ চরিত্রের বিশ্লেষণ আছে। চরিত্রের বহিরঙ্গের পারিপাট্য নয়, বরং অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে কতিপয় মানবীয় শাশ্বত প্রবণতা। সেই সঙ্গে বাঙালি কবিদের মানব জীবন পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সৃষ্টি ক্ষমতা উপলব্ধি করে বিস্মিত হতে হয়। ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, চরিত্র অঙ্কনে বাঙালি মধ্যযুগীয় কবিরা প্রায়শই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এর কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘাত-প্রতিঘাত ও জটিলতা আবিষ্কার পাঠক হিসেবে আমাদেরও আন্দোলিত করে। তবে দেখা গেছে, মধ্যযুগে নারী-প্রতিমা নির্মাণে কবিরা যতটা কুশলতা ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন, পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে ততোটা নয়। হিসেব করলে দেখা যায়, ঊনসত্তরটি নারী ও ঊনআশিটি পুরুষ চরিত্র তিনি আলোচনা করেছেন। অতএব, বুঝাই যাচ্ছে, সামান্য-অসামান্য বিচারে তিনি কোন চরিত্রকেই বাদ দেন নি। শুধু তাই নয়, চণ্ডী চরিত্রটি গোর্খবিজয়, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল,

শিবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন পৃথক আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি জয়দেব, বড়ুচণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবির 'রাধা'-কেও তিনি আলাদা করে বিচার করেছেন। একই পদ্ধতির প্রয়োগ পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রেও। বিভিন্ন কবির 'কৃষ্ণ' অথবা 'চৈতন্য', নানা কাব্যের 'শিব' বা 'নারদ' এখানে স্বতন্ত্র। গবেষক বেশ কয়েকটি নারী চরিত্রের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। বিজয় গুপ্তের মনসা কেন ভয়ঙ্করী— এর পারিপার্শ্বিক কারণ তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন যে, মায়ের স্নেহহীনতা, পিতার অনাদর, স্বামীর প্রেম ও সঙ্গসুখ বঞ্চনা মনসার মধ্যে 'ফান্ডামেন্টাল ইভিল'-কে জাগ্রত করে বলেই সে অকল্যাণী, ঘাতিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়। লহনা চরিত্রেও তেমনি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। খুল্লনার প্রতি তার ব্যবহার, বিশেষ করে ধনপতির অবর্তমানে ছাগল রাখার কাজে খুল্লনাকে ব্যাপৃত করে তার রূপ-যৌবনে ধস নামানোর চেষ্টা, বিগত যৌবনা লহনার মানসিক স্যাডিস্টিক প্লেজার বা ধর্ষকামিতার পরিচয় বহন করে। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা সম্পর্কে ডক্টর শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য: 'রাধা চরিত্র অঙ্কনে বড়ু চণ্ডীদাস যে অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তা হল জটিল মনস্তাত্ত্বিক রহস্যভেদ— আরও সূক্ষ্মভাবে বলা যায় যৌনবোধভিত্তিক (সেক্স সাইকোলজিক্যাল) মনস্তাত্ত্বিকতায় কবির সাফল্য।' তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে এগারো বছরের বালিকা রাধা দীর্ঘ দুই বসন্ত পর দেহে ও মনে রমণীত্বে পৌঁছেছে। রাধা চরিত্রের এই পরিবর্তন বিষয়ক ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত-এর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে' গ্রন্থে বিস্তৃত উল্লেখ থাকলেও চরিত্রটির তুলনামূলক বিবর্তনধারা অন্বেষণ করেছেন ড. গাঙ্গুলি। আর এ কারণে তাঁর গ্রন্থে রাধা চরিত্রের বিভিন্নতা পাঁচটি ছক অঙ্কন করে ভিস্যুয়াল করার চেষ্টা আছে।

'মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে পুরুষচরিত্র' গ্রন্থেও ওই সময়ের বাংলা কাব্য-সাহিত্যে উঠে আসা পুরুষগুলোর বৈচিত্র্যময় জীবন-প্যাটার্নের সউল্লেখ-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। গবেষক এখানে চরিত্রগুলো যদিও দেখেছেন সামাজিক শ্রেণীচেতনার আলোকে; তারপরও বৈচিত্র্য যেন তাঁর একনিষ্ঠ অন্বেষণ। আর তাই 'শিব' চরিত্রটিতে তিনি আবিষ্কার করেছেন :

ক. দরিদ্র বৃদ্ধ ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ; খ. বৃদ্ধ শিথিল চরিত্র ব্রাহ্মণ; গ. কৃষক ব্রাহ্মণ; ঘ. অন্ত্যজ অভদ্র ধ্বংসকারী দলের নেতা— এই চার রূপ। আসলে বৃত্তিভেদে চরিত্রের মধ্যেও যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এবং মধ্যযুগেও তা ছিলো স্পষ্ট। ডক্টর গাঙ্গুলি সে-বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-সাহিত্য, নাথপন্থী সাহিত্য, চৈতন্যচরিত বিশেষত চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত এবং রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের পুরুষ চরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ

করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রধান দুটো পুরুষ চরিত্র চাঁদ সদাগর ও লখীন্দর আলোচনার পাশাপাশি অপ্রধান চরিত্রগুলোও বিশ্লেষিত হয়েছে। এই গৌণ চরিত্রসমূহকে তিনি ভাগ করেছেন এভাবে :

ক. দেবতা ও দেবকল্প ঋষি; খ. চাঁদ সদাগরের সহযোগী ও আত্মীয়; গ. কাজী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ; ঘ. দক্ষিণ পাটনের রাজা ও পারিষদবর্গ; ঙ. অন্যান্য সাধারণ লোক। 'চণ্ডীমঙ্গলে' অবশ্য 'দেবখণ্ড', 'কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতির আখ্যান— এই তিনভাগে আলোচনা বিস্তৃতির দিকে গেছে। প্রথমভাগে শিব, দক্ষ ও নীলাম্বরের চরিত্র আলোচিত হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগে প্রাধান্য পেয়েছে কালকেতু, মুরারিশীল, ভাঁড়ু দত্ত; আর তৃতীয় ভাগে ধনপতি, শ্রীপতি। এভাবে ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শিবায়ন ইত্যাদিতে পুরুষ চরিত্রগুলোর উল্লেখ আছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থে যেমন রাধা চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের একটি ধারা তুলে ধরা হয়েছিলো, এ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রটির পরিবর্তমানতা তুলে ধরা হয়েছে অনুপুঙ্খভাবে। বিশেষ করে জয়দেব, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস— এই ছয়জন কবির পরিস্ফুটিত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রগুলোর মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে এখানে। শিব ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের মতো নানা রূপের পারস্পরিক তুলনা না থাকলেও 'চৈতন্য' চরিত্রটি আলোচিত হয়েছে কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের প্রেক্ষাপটে। একই অবস্থায় 'নারদ' চরিত্রটি যে 'শিবায়নে' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র স্বল্প উপস্থিতি সত্ত্বেও যথেষ্ট ইঙ্গিতময় হয়ে প্রতিস্থাপিত, তার উল্লেখ আছে এখানে। এই সাদৃশ্যকল্প চরিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে গবেষককে। কিন্তু তিনি এরই মধ্যে অগ্রসর হয়েছেন লক্ষ্যের অভিমুখে। কারণ এতদ্‌সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বোধ তিনি লালন করেছেন প্রথম থেকেই। তাঁর উল্লেখ : 'শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পুরোই তাঁর নিজের সৃষ্টি বা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। কিন্তু ধনপতির অনেকটাই চণ্ডীমঙ্গলের গল্পস্রোতে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি দ্বিজমাধব কিংবা কবি মুকুন্দ হতে পেয়েছেন। তারপরে তারা নিজের নিজের মত তার সাজসজ্জার বিধান করেছেন, রঙ পালিশ দিয়ে তাকে বিশিষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ মুকুন্দরামের ধনপতি বা ভাঁড়ু পুরোপুরি মুকুন্দের উদ্ভাবিত নয়, প্রথানুগ ধনপতি + মুকুন্দের বিশিষ্টবোধ = মুকুন্দের ধনপতি; প্রথানুগ ভাঁড়ু দত্ত + মুকুন্দের বিশিষ্টবোধ = মুকুন্দের ভাঁড়ুদত্ত। বিশিষ্ট বোধের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটে বলেই মুকুন্দের ধনপতি এবং ভাঁড়ুদত্তের পার্থক্য।'— এই পার্থক্য-বিচারের সচেতনতার প্রয়োগ ডক্টর শম্ভুনাথ গাঙ্গুলির গ্রন্থে লক্ষ করা যায়।

'মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় লেখক উল্লেখ করেছেন : 'বাংলার ধর্ম শুধু কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান নয়, শুধু কিছু বিশ্বাস নয়, এমন কি শুধু কিছু বিশিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব নয়। এই সব কিছুর মধ্যে নিহিত বাঙালির বাঙালিত্ব, তার আধুনিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস-নব্যবিশ্বাস-পরিবর্তিত বিশ্বাস সর্বত্র অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে যে বাঙালিত্ব।'— এই চিন্তার প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায় ডক্টর শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত গ্রন্থে। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে লেখক তাঁর গ্রন্থটিতে আলোচনা বিন্যাস্ত করেছেন। বৌদ্ধ সহজযান এবং চর্যাপদ; বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিকাশ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বৈচিত্র্য (চৈতন্য-পূর্ব); মঙ্গল দেব-দেবী এবং বাঙালির লৌকিক ধর্ম; বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিকাশ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বৈচিত্র্য (চৈতন্য-পর্ব); বৈষ্ণব-প্রভাব: সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা; নাথধর্ম ও সাহিত্য; বাঙালির শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য; ইসলাম ধর্ম এবং আখ্যান কাব্য আলোচনার পূর্বে পটভূমি হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন বাঙালির ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যের প্রবণতা, ঐতিহাসিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এই ধর্মাশ্রয়কে, এছাড়াও তুলেছেন নন্দনতাত্ত্বিক প্রশ্ন। বাঙালির ধর্মজীবন ও সাহিত্যে এর প্রতিফলন বিষয়ক আলোচনায় ড. শম্ভুনাথ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন: 'বৌদ্ধ হিন্দু এবং ইসলাম— এই তিনটি ধর্ম সংশ্লিষ্ট সমাজ, তাদের দ্বন্দ্ব সমন্বয়, তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ইতিহাস এবং অপরাপর ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে সে ইতিহাসের পালাবদল— এগুলির দিকে লক্ষ রেখেই সাহিত্য ধর্মের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা সঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিন্তা জাগ্রত থাকা প্রয়োজন, তা হল নিম্নবর্গ মানুষের লোকায়ত ধর্মাচরণ প্রতিমুহূর্তে পূর্বোক্ত তিন প্রধান ধর্মের শাস্ত্রানুমোদিত পন্থার সঙ্গে নানা মাত্রায় যুক্ত হয়েছে, তাকে প্রভাবিত করেছে, বিকৃত করেছে, স্বতন্ত্র করেছে। এই লোকায়ত ধর্মবোধ ও ধর্মসাধনা অনেক সময়ে পূর্বোক্ত তিনটি প্রধান ধর্মের মধ্যকার দূরত্ব দূর করে তাদের কাছাকাছি এনেছে। উপর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রধানদের চাপ না থাকলে হয়তো লোকায়ত ধর্মসাধনা ও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রটি আরো ব্যাপক হতে পারত এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনেক সহজ গভীর আত্মীয়তা তৈরি হয়ে উঠত, যেমন এক সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ঘটেছিল।' প্রকৃতপক্ষে, এই 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রধানদের চাপ' বাঙালির মধ্যে মানসিক ঐকমত্য সৃষ্টির পেছনে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিলো এবং অদ্যাপি তা তিরোহিত হয় নি। লেখক প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধর্মকেন্দ্রিক দার্শনিকতা, ঈশ্বর সম্পৃক্ত চিন্তাধারা, সাধন পদ্ধতি, সাধ্যবস্তু, দেব পরিমণ্ডল প্রভৃতি বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। হিন্দু বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে

সম্পৃক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্য কি রূপ পরিগ্রহ করেছিলো তারও সুচারু উল্লেখ আছে এতে। তান্ত্রিকতা, সহজ সাধনা, রসায়নবাদ প্রভৃতি ক্রমবিকাশ বাংলা সাহিত্যকে কতোটা তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছিলো সে-কথাও এখানে আছে। আসলে ওই সময় বাংলা সাহিত্যে বাঙালির ধর্মীয় জীবন তথা ধর্মভাবনা ও চর্চার প্রতিফলন পড়েছে ব্যাপকভাবে। আর একারণেই হয়তো গবেষক গাঙ্গুলি বলেছেন: 'বাঙালির ধর্মীয় জীবন', 'ধর্মভাবনা' না বলে যদি বলা হয় বাঙালির 'জীবন ও ভাবনা' তাহলেও কিছু কম বলা হয় না। কারণ সেকালের জীবনযাত্রা এবং চিন্তাধারা ছিল ধর্মসম্পৃক্ত। ধর্ম ও জীবনের মধ্যে কোথাও বেড়া বা আগর ছিল না। তার মানে এই নয় যে বাঙালি ছিল অতিমাত্রায় ধর্মমুখী এবং জীবনবিমুখ। আসলে তার ধর্ম ও জীবন ছিল ওতপ্রোত। এ এক আশ্চর্য ধর্ম— এ এক আশ্চর্য জীবন।' বাঙালির চর্চিত ধর্ম ও মতে স্থান ও কালভেদে নানা পার্থক্য লক্ষ করা গেলেও মৌলচিন্তা ও ধাতুগত দিক থকে এখানে আবিষ্কৃত হয় ঐক্যের সুর। আর এই ঐক্যই বাঙালিকে একত্বের মহান পতাকাতলে সমবেত করে ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও। ড. শম্ভুনাথ তাঁর এ গ্রন্থে লোকায়ত ধর্মগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেন নি। যাঁরা প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদকে প্রায়-তুচ্ছ করে সুফী বা বাউল কিংবা রাধাবল্লভী বা নমোবৈষ্ণবী পন্থায় সব জাতের মানুষকে বিশেষ বন্ধনে একীভূত করতে চেয়েছেন— তাঁদের প্রসঙ্গ আলোচিত হলে গ্রন্থটি পূর্ণতর হতো। তাছাড়া আর একটি প্রসঙ্গ আলোচিত হলে গ্রন্থটি পূর্ণতর হতো। তাছাড়া আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেই হয় যে, গবেষক ঈশ্বরী পাটনী নারী না পুরুষ এ প্রশ্নে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি বলে চরিত্রটি উল্লিখিত দুটো গ্রন্থেই পৃথক আলোচনা করেছেন। গবেষকের ব্যুৎপত্তির শেষ পর্যায়ে উন্নীত হলে তাঁর কাছে পাঠকের একটি মাত্র সিদ্ধান্তেরই প্রত্যাশা থাকে। এক্ষেত্রে গবেষকের দোলাচল মনোবৃত্তির অর্থই পাঠকের বিভ্রান্তি— বিশেষ করে একটি চরিত্রই যখন দুটো গ্রন্থে পৃথকভাবে আলোচিত হয় নারী এবং পুরুষ বিবেচনায়।

ডক্টর শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থ তিনটিতে আধুনিক জীবনদৃষ্টি নিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: 'একালের ছাত্ররা পুরনো যুগটাকে এড়িয়ে যেতে চায়। শম্ভুনাথ তার ব্যতিক্রম। আধুনিক মনের মানুষ হলেও তিনি পুরনো সাহিত্যকে ভালোবাসেন, তার গভীরে প্রবেশ করতে চান। এযুগের বোধ নিয়ে সেকালের সাহিত্য পাঠ করলে এমন সুফল মিলতে পারে যা পুরনো যুগের সাহিত্য-রসিকরা জানতে পারেন নি।' মধ্যযুগের পৃথক বিষয় নিয়ে রচিত গ্রন্থ তিনটিতে রচয়িতার এই জীবনবোধ ও রসবোধ ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে নারীচরিত্র, প্রথম প্রকাশ: ১ মার্চ ১৯৯১, পুস্তব বিপণি, কলিকাতা, পৃ. ১৪৮; মূল্য । ২৫ রুপি

মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে পুরুষচরিত্র, প্রথম প্রকাশ : ২১ আগস্ট ১৯৯২, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, পৃ. ১৮১; মূল্য । ৪০ রুপি

মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ : ১০ জুলাই ১৯৯৪, পুথি প্রকাশনা, কলিকাতা, পৃ. ১৬২; মূল্য । ৫০ রুপি

সৌমিত্র শেখর